কপালকুণ্ডলা চরিত্র

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এক সময় দীনবন্ধু মিত্রকে জানিয়েছিলেন— তিনি এমন একজন স্ত্রী চরিত্রের কল্পনা করছেন যে যৌবন কাল পর্যন্ত সমাজের স্পর্শ পায়নি। বনের মধ্যে বড়ো হয়ে উঠেছে। এমন এক চরিত্র যদি সমাজ পরিবারের মধ্যে এসে দাঁড়ায়, তাহলে তার মধ্যে কেমন পরিবর্তন হবে ? সে কি মেনে নেবে সমাজের নীতি নৈতিকতা নাকি পারবে না। এ প্রশ্নের কোনো স্থির সিদ্ধান্ত সে দিন হয়নি। অথচ আমরা উপন্যাসে দেখতে পাই— দূর্ঘটনাগ্রস্থ যাত্রীবাহী জাহাজ থেকে সমুদ্র উপকূলে ভেসে আসা শিশু তথা কপালকুণ্ডলা পালক পিতা কাপালিকের আশ্রয়ে এবং মন্দিরের সেবকের সহচর্যে বড় হয়ে উঠেছে। ঘটনাক্রমে নবকুমারের সঙ্গে বিয়ে হয়। এক বছর সংসার করে। কিছু কিছু পরিবর্তন তার মধ্যে এলেও আবাল্য মুক্ত অরণ্যের সহচর্য ত্যাগ করে তার থাকা হয়নি। এ ক্ষেত্রে সে কেবল মুক্তাঞ্চলকে বুকে টেনে নিয়েছে তা নয়, সেই সঙ্গে আপাত সভ্য সমাজের মুখোশ খোলার সঙ্গে সঙ্গে তাকে বহিষ্কারও করেছে। আর এভাবেই কপালকুণ্ডলা চরিত্রের মধ্যে ফুটে উঠেছে নানা মাত্রা। যথা,—

ক) পরোপকারী

খ) ব্যক্তি স্বাতন্ত্র

গ) প্রতিবাদী সত্তা

পরোপকারী সত্তা বিষয়টি ফুটে উঠেছে নবকুমার উদ্ধার, ভিখারীকে স্বর্ণ দান, শ্যামাকে সাহায্যের জন্য রাতের অন্ধকারে জঙ্গলে বেরিয়ে পড়া প্রভৃতি ক্ষেত্রে। সেই সঙ্গে তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবোধের পরিচয় ফুটে উঠেছে কাপালিকের অস্ত্র গোপন করে নবকুমারকে অধিকারীর কাছে নিয়ে যাওয়ার সময়। আবার সেই নবকুমারকেই অস্বীকার করে রাতের অন্ধকারে বাড়ি ছাড়ার মধ্যে কিংবা পদ্মাবতীর স্বর্ণ সম্পদ উপেক্ষার মাধ্যমেও ফুটে ওঠে কপালকুণ্ডলার স্বাতন্ত্রবোধ। অবশ্য এর মধ্যে জাগরিত থেকেছে তার প্রতিবাদী সত্তা। এই প্রতিবাদী সত্তার চরমতম প্রকাশ লক্ষ করি শ্যামার সঙ্গে কথোপকথোনে। কপালকুণ্ডলার কাছে স্ত্রী-পুরুষের বিভেদ নেই। অথচ সমাজ নৈতিকতা যখন স্মরণ করিয়ে দেয়— নারী তুমি অবলা, তুমি দাসী, তুমি স্বামীর ছায়া মাত্র। তখন কপালকুণ্ডলার হৃদয় গর্জন শোনা যায় এভাবে—'যদি জানিতাম যে, স্ত্রীলোকের বিবাহ দাসীত্ব, তবে কদাপি বিবাহ করিতাম না।' এ উক্তি তথা দেড়শো বছর পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র সৃষ্ট কপালকুণ্ডলা আমাদের চমকিত করে। সেইসঙ্গে শ্যামার নির্দেশ মত মহিলা কতৃক রাতের অন্ধকারে বন থেকে নির্দিষ্ট ফুল আনতে কপালকুণ্ডলার সিদ্ধান্তে বাধা হয়ে দাঁড়ায় নবকুমার। তখন কপালকুণ্ডলা বলে ওঠে — 'আইস, আমি অবিশ্বাসিনী কি না, স্বচক্ষে দেখিয়া যাও।' এক্ষেত্রে ফুটে উঠেছে — স্বামী ধ্যান, স্বামী জ্ঞান, স্বামী চিন্তামনী —এ ধারণার প্রতি প্রতিবাদ। ঘটনাক্রমে দেখা হয় মতিবিবি তথা লুৎফ-উন্নিসা তথা নবকুমারের স্ত্রী পদ্মাবতীর সঙ্গে। পদ্মাবতী ধন সম্পদ ঐশর্যের বিনিময়ে কপালকুণ্ডলার কাছ থেকে কিনে নিতে চায় নবকুমারকে। কপালকুণ্ডলা তার অন্তকরনে অস্তিত্বহীন নবকুমারকে দিতে স্বীকৃত হয়। কিন্তু অস্বীকার করে পদ্মাবতী ঐশর্যের বিনিময়কে । এ অস্বীকার কি কেবল পদ্মাবতীকে ? এ কি তাদের প্রতি চপেটাঘাত নয়? যারা নারী-পুরুষ সম্পর্ক কিংবা ভালোবাসার মূল্য টাকা দিয়ে হিসেব করে! সর্বপরি কপালকুণ্ডলার তীব্র অথচ আন্তরিক প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে স্বেচ্ছা আত্মহত্যা প্রসঙ্গে। যখন রূপমুগ্ধ নবকুমার বলে ওঠে—'কপালকুণ্ডলে! আমায় রক্ষা কর। এই তোমার পায়ে লুটাইতেছি—একবার বল যে, তুমি অবিশ্বাসিনী নও—একবার বল, আমি তোমায় হৃদয়ে তুলিয়া গৃহে লইয়া যাই।' পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগে হত্যা কাণ্ড ঘটবে কপালকুণ্ডলার, তবে নবকুমার কেন বলছে ? 'আমায় রক্ষা কর।' আসলে এ পর্বে নবকুমারশূণ্য কপালকুণ্ডলার হৃদয় এবং রূপমুগ্ধ নবকুমার উভয়ই উভয়ের প্রতি আন্তরিক হয়ে ওঠে। ভুল রক্ত-মাংসের মানুষেরই হয়— একথা যেমন অস্বীকার করা যায় না। তেমনি অস্বীকার করা যায় না কপালকুণ্ডলার প্রতি নবকুমারের

ভালোবাসাও। সেইসঙ্গে এ কথাও কিন্তু স্বীকার করতে হয় এ ভালোবাসা আসলে একজন অবিশ্বাসির ভালোবাসা। তাই ঘরে তো কপালকুণ্ডলাকে নিয়ে যাওয়া হবে, কারণ সে হৃদয়ের সামগ্রী। তাকে ছাড়া জীবন বৃথা। তবে তার আগে কপালকুণ্ডলাকে যে প্রমাণ দিতে হবে সে অবিশ্বাসি। কপালকুণ্ডলা প্রমাণ দিয়েছে। রামায়ণে সীতাকেও প্রমাণ দিতে হয়েছিল। সীতা মাটির মধ্যে প্রবেশ করেছিল। কপালকুণ্ডলাও নিমজ্জিত হল জলের স্রোত আর মাটির ধস এর মধ্যে। নবকুমারের 'আমায় রক্ষা কর' আবেদনেরও শেষ রক্ষা হল না। কারণ আমির অস্তিত্ব যে পালটে গিয়েছে। এ নবকুমার আর সাগরসঙ্গমের দীপ্ত যুবক নয়, যুক্তিবাদী নব্য নয়, সাহযী উদ্ধারকর্তা নয়; এ সেই নবকুমার যে নিজের স্ত্রী পদ্মাবতীকে যবন তথা মুসলমান বলে উদ্ধার করতে পারেনি, এ সেই নবকুমার যে অবিশ্বাসে অন্ধ হয়ে স্ত্রী কপালকুণ্ডলাকে হত্যার জন্য কাপালিকের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। তাই রোমান্সের নায়িকা কপালকুণ্ডলার বাস্তবসম্মত প্রতিবাদ সাহিত্যের ধারায় বিরল দৃষ্টান্তের সৃষ্টি করেছে। এই বিরল হয়ে থাকার মধ্যেই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে কপালকুণ্ডলার স্বীকৃতি।

banglasahitya.in